প্রতিবাদ ছাড়া বাঁচার কোন রাস্তা নেই আর

জয়া মিত্র

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনের প্রথমদিকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি ছিল কলকাতার গড়ের মাঠ থেকে হলওয়েল মনুমেন্ট নামে স্মারক'টির অপসারণ। নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লার নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রচার করে যে কলকাতার বৃটিশ দুর্গ জয় করবার পর নবাব পরাজিত সৈন্যদের, নারী ও শিশুসহ অত্যন্ত ছোট একটি ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল। সেখানে দম আটকে তাদের মৃত্যু হয়। ওইভাবে মানুষের মত্যু ঘটানো ব্যাপারটা এত অমানবিক, এমন কলঙ্কজনক, নৃশংস যে একজন রাজার রাজ্য কেড়ে নেওয়ার অন্যতম অজুহাত হিসেবেও সেই কথা প্রচার করা যায়। একশ বছরেরও বেশি সময় পর একজন যুবনেতাকে সেই কলঙ্ক অপ্রমাণ করতে হয়। স্বাধীনতার পঞ্চান্ন বছর পরে দেশের সবচেয়ে প্রগতিবাদী, চিন্তাশীল, সবচেয়ে মানবাধিকার সচেতন রাজ্যে সত্যি সত্যি সে ঘটনা ঘটল। ২ আগস্ট শুক্রবার মালদহ জেলা আদালতে ৩০০ বর্গ ফুট জায়গার একটি জানলা ভেন্টিলেটারবিহীন ঘরে ২৬২ জন মানুষকে সারাদিন অনাহারে, পানীয় জল পর্যন্ত না দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়। আশ্চর্য যে দশ বারো ঘন্টা পর তাদের মধ্যে দু'জনই মারা গিয়েছেন। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ছয় না দশ না কুড়িজন -- এ বিষয়ে নানা মত শোনা যাচ্ছে। কারও মনে হতে পারে যে, ওখানে ওই অবস্থায় আটকে থাকা মানুষের মধ্যে একজনও কি সুস্থ ছিলেন দিনের শেষে ?

যেহেতু খবর এখনও সত্যিই ছোটে বাতাসের আগে, আমরা ভাবতে পারি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পুরো পৃথিবী এই হত্যার খবর জেনে ফেলেছে। কী করে তাদের বোঝানো যাবে আমরা তত খারাপ নই ? আফগান যুদ্ধের শেষদিকে কুন্দুজ শহরের আত্মসমর্পণকারী আড়াইশ সৈন্যকে বন্দি করে সমুদ্রপথে পাঠানোর সময় মার্কিনবাহিনী তাদের এমন 'কন্টেনার' (!) -এ বন্ধ করেছিল যে তারা মারা যায়। আমাদের রাজ্যে মোটেই সেই কুন্দুজকাণ্ডের কোনও গ্রাম্য সংস্করণের রিহার্সাল হচ্ছিল না আমাদের রাষ্ট্র বা বিচারব্যবস্থা ও রকম 'মধ্যযুগীয়' কোনও শাস্তির ব্যবস্থা করে না কোনও নাগরিকের জন্য।

আর সেইটেই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। মালদহের ওই অন্ধকূপ-হত্যা কেউ ইচ্ছা করে ঘটায়নি। কাউকে শাস্তি দেবার জন্য, কোনও ক্রোধ কিংবা প্রতিশোধস্পৃহা থেকে কেউ ওই ভয়ানক পীড়ন চালায়নি বন্দিদের ওপর। আদালত, পুলিশ, প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, যাঁরা ওই কোর্ট চত্বরের খবরাখবর রাখেন সকলেই বলেছেন, এরকম তো থাকেই। 'হ্যাঁ, জায়গাটা খুব ছোট', 'অনেকবার তো বলেছি জায়গাটা বাড়ানোর কথা', 'এক-তৃতীয়াংশ তো ফাইন জমা দিয়েই দিয়েছিল, কেন যে ছাড়া পায়নি !' চল্লিশজনের থাকবার জায়গায় তিনশোজন

সেকাথা বাদ দিলেও, চল্লিশজনেরই কি পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে ওই হাজতঘরে ? নেই । বারো ঘণ্টা বন্ধ থাকা মানুষগুলি সারাদিন খাবার পাচ্ছিলেন না কয়েক সপ্তাহ (নাকি কয়েক মাস ?) ধরে । বিল পাননি বলে কণ্ট্রাকটরের খাবার সরবরাহ বন্ধ ছিল । জেলে ও কোর্ট-হাজতে কি খাবার বন্দিদের সরবরাহ করে কে কত বিল দাখিল করেন ও পান সেকথা সকলেরই জানা । তবু যদি বিল না পাওয়া গিয়ে থাকে খাবার দেওয়া বন্ধ করবার আগে নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে তা জানানোর কথা । এক্ষেত্রে জানানো হয়েছিল ? কোর্ট ইন্সপেক্টর জানতেন ? কে কে জানতেন ? দেখা যাচ্ছে অনেকেই জানতেন । কোর্ট চত্বরে যে মানুষগুলোকে আইনরক্ষকরা নিয়ে আসেন বিচারকের সামনে হাজির করবার জন্য, তারা যে কি অসহ্য অমানুষিক অবস্থার মধ্যে থাকেন, সেকথা মোটামুটি সকলেই জানেন । গরমে আধমরা মানুষগুলোর না খাওয়া শরীর থেকে অজস্র ঘাম বেরিয়ে যাবার দরুণ মরণান্তিক জলতেষ্টা পায় । জলের পাত্র বাইরে রাখা থাকে, চুমুক দেবার দাম পঞ্চাশ টাকা । দম আটকে এলে একবার খোলা বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার দাম পঞ্চাশ টাকা । এত পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কী করেন পুলিশ কর্মীরা ? মিষ্টি কিনে নিয়ে গিয়ে নিজেদের ছেলেমেয়েদের-কে খাওয়ান ? স্ত্রীকে উপহার কিনে দেন ? বাচ্চাদের দামি ইস্কুলে পড়ান ? নিজেদের শখ-সাধ পূরণ করবার জন্য তাঁদের টাকার দরকার হয় না, উর্দিই যথেষ্ট । অন্তত যাঁরা মালদহ আদালতে ডিউটি করেন, তাঁদের হয় না, তাঁরা ক্ষমতাকে কত বিকৃতভাবে ব্যবহার করতে পারেন তা প্রমাণিত । কেন এরকম হলেন পুলিশ কর্মীরা ? সাধারণ মানুষের ঘর থেকে চাকরি করতে আসে তো পুলিশ ! মরণাপন্ন মানুষের তেষ্টার জলটুকু দিতে ঘুষ নেন, ঘুষের টাকা না পেলে কোর্টে ফাইন জমা দেওয়া গরিব লোককে হাজতে বন্ধ করে রাখেন ! কেন ?

মালদহের এই ঘটনার পরও সেই পুলিশদের এবং সে সব ক্ষমতাসীন লোকেদের কিছুই আসবে যাবে না, কারণ তাদের কাছে তো সমস্ত ব্যাপারটাই জানা । কিন্তু যাঁরা তাদের আত্মীয়-বন্ধু-পরিজন ? তাঁরা কি কোথাও বাধা দেবেন ? আমরা শুনেছি দোষী পুলিশদের শাস্তি হবে । যে অত্যাচার রোজ ঘটে তার জন্য কে দায়ী নয় ? শাস্তি মানে ট্রান্সফার ? তাতে, যে কোনও শাস্তিতে, কোনও ফল কি সত্যিই হয় যখন সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যেই ক্ষমতাশালী অন্যায় অনন্ত প্রশ্রয় পায় ? পুলিশ প্রহরীরা স্বেচ্ছাচারী কিন্তু স্বরাট্ কি ? তাদের কুৎসিত বীভৎসতায় অনেকের বখরা থাকে । কী শাস্তি হবে তাদের ?

প্রথম নাড়া পড়তেই দেখা গেল কোর্ট হাজতে এই অমানুষিক অবস্থা কেবল মালদহে নয়, অনেক জায়গাতেই । মালদহের মত ঘটনা যে কোন জায়গাতেই ঘটতে পারত । কেউ কেউ অবাক হয়ে ভাবতে পারেন, কী এমন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটলযে একদিনে প্রায় তিনশো লোককে আদালতে হাজিরা করতে হল ? চল্লিশজন ও থাকতে পারে না, তেমন জায়গায় ? দেখা যাচ্ছে বন্দিরা বেশিরভাগই

সামান্য 'ফাইন'-এর, মানে যাকে বলে 'পেটিকেসে'র আসামি এবং তাদের অনেকেই 'ফাইনে'র টাকা জমা দিয়েছিলেন। তবু অন্যদের 'খুশি' না করলে 'রশিদ হারিয়ে যাবে' বলে সোজাসুজিই বলে দেওয়া হয়েছিল তাদের। পঞ্চাশ টাকা দিলে ঠাসাঠাসি গরম থেকে একবার বাইরে এসে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। যাদের শাকরেদরা একেবারেই দু-পাঁচ হাজার দিয়ে দেয় তারা গাড়ি করে আরামসে নিজেদের ডেরা পর্যন্ত চলে যেতে পারে তো? তাহলে কোর্ট চত্বর থেকে প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে কুখ্যাত বন্দি পালানোর ব্যাখ্যা সকলের বোধগম্য হল। ধুলোগুলো ছাপানো থাকে। ছুঁড়ে নয়, সেগুলো ধীরে সুস্থ হাতেই দিয়ে যাওয়া হয়, যথাযোগ্য হাতে।

বাহাত্তর-তিয়াত্তর সালের প্রেসিডেন্সি জেলের দু-একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও। দোতলার যে সেলগুলায় আমারা এক-একা চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ থাকতাম, তার একতলাতেও ছোট ছোট সেল ছিল। সেগুলোর ভিতরে কোনরকম আলো বা হাওয়া কখনও ঢুকত না। তাদের সামনে ঘুপচি মত ঢাকা বারান্দা, তারপরই কিন্তু মস্ত বড় খোলা উঠোন। ওই অন্ধকার সেলগুলোতে প্রথমে আমাদের মেয়েরাই ছিল, কিন্তু তাদের সঙ্গে অন্য মেয়েরা লুকিয়ে ফাঁক-ফোকরে কথা বলে, সেজন্য ওদের দোতলায় বন্ধ করা হল। একতলায় এনে রাখা হয়েছিল কয়েকটি পাগল মেয়েকে। এদের পরনের কাপড় দেওয়া হত না (পাছে ওরা তা দিয়ে গলায় দড়ি দেয়), খাবারটা একটা টিনের থালায় ঢেলে দূর থেকে সেলের ভিতর ঠেলে দেওয়া হত। কখনও কখনও সেটা দরজার সামনে, ওদের হাতের নাগালের মধ্যে পৌঁছাতো না, কখনও কোন বন্দিনী এত দুর্বল হয়ে যেতেন যে উঠে থালাটা পর্যন্ত নিতে পারতেন না। ভাত, ডাল কাক ও বেড়ালের পেটে যেত। বন্দিনীদের জন্য আসা খাবারের মধ্যেরও ভাল অংশটুকু, অনেকটা ভাত, পাগল বা রোগিদের জন্য আসা মাছ, দুধ প্রায় সবটাই তুলে রাখত কয়েকটি মেয়ে। কয়েকটি সুবিধাপ্রাপ্ত বন্দি মেয়ে। ডিউটি ওয়ার্ডররা সবাই আট ঘণ্টা ডিউটির শুরুতে ও শেষে সেই খাবারগুলো পেট ঠেসে খেয়ে যেত।

একদিন গ্রীষ্মের সন্ধ্যেবেলা আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম একতলার সেল থেকে মুকুল নামে একটি পাগল মেয়ে একটানা 'জল দাও একটু জল দাও গো' বলে যাচ্ছিল। নিস্তব্ধ হয়ে আসা বন্দিশালার উঠোন জুড়ে সেই ঘ্যানঘ্যানে প্রার্থনা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বন্দিনীদের ভাগের খাবার পেট ভরে খেয়ে ওয়ার্ডার সেলের সামনে উঠোনে বালতি করে জল নিয়ে হাত ধুচ্ছিল, কুলকুচো করে কতদূর জল যেতে পারে তাই নিয়ে হাসছিল। এরা যে মুকুলকে বিশেষভাবে শাস্তি দিতে চাইছিল বা অত্যাচার করে কোনও সন্তোষ পাচ্ছিল তা নয়। ওরা মুকুলের বা মুকুলের খিদে ক্লান্তি কিংবা তেষ্টাকে খেয়াল করছিল না। করবার দরকার হয় না। হতাশায় মেয়েটি মাথা ঠুকতে ঠুকতে অজ্ঞান হয়ে গেলেও না। জ্ঞান আপনিই ফিরবে। না ফিরলে মরে যাবে। যারা আইন রাখার চাকরি করে তাদের কোথাও কৈফিয়ত দেবার দায় নেই। তারা বন্দি মায়েদের কচি সন্তানের নামে আসা দুধ দিয়ে কফি করে

খেয়ে ফেলতে পারে, জনযুদ্ধের সমর্থক তরুণীর কাপড় খুলে নিতে পারে ছেলে কি মেয়ে বোঝার জন্য, তারা যথেষ্ট পয়সা না পেলে বন্দি হয়ে থাকা মানুষকে তেষ্টার জল না দিতে পারে? দু-চারজন অমন মরে গেলে সত্যি কী আসে যায়?

এ অবস্থা, এই মনুষ্যত্ববিহীন উদাসীনতা (এই কি 'ক্যালাসনেস!') একদিনে, দু-এক মাসে হয় না। এই বোধহীনতা তৈরি হয়ে উঠতে অনেক সময় লাগে। ব্যবস্থা ও পরিপার্শ্বের অনেক প্রশয় লাগে। জেলকে এখন কারেকশনাল হোম বলা হয়। মুকুলদের মত পাগলরা এখন আলাদা হাসপাতাল ওয়ার্ডে থাকে। তাতে কী হয়? কিছু পাল্টায়? পাল্টাতে পারে? মেদিনীপুর, বহরমপুর জেলের ভেতরে বন্দিদের নিজেদের দৈনিক খাবার পেতে হলেও রীতিমত পয়সা দিতে হয় একথা খবরের কাগজে সবাই পড়েছেন।

আমি এ প্রশ্নে যাচ্ছি না যে বিচারধীন বন্দিকে নির্দোষ বলেই ধরতে হবে কারণ তার দোষ প্রমাণিত হয়নি, সুতরাং কোন কষ্টই তার পাওয়ার নয়। বরং, যদি একজন বন্দি কয়েদিই হয়? যে অপরাধের সাজা খাটছে? সে, তাহলে কি আর মানুষ পদবাচ্য থাকে না? যাঁরা তার দোষের শাস্তি বিধান করে কারাগারে (থুড়ি, সংশোধনাগারে) বন্ধ করেন, তাকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব কি সেই সরকারি ব্যবস্থা ও তার এজেন্সিগুলির ওপর থাকে না? জঘন্যতম অপরাধে যাঁদের একবছর এগারো মাস কারাদন্ড হয়েছে তাঁরা নির্বাচনে জিতে আরও অনেক অনেক দুর্নীতিতে দেশকে ডুবিয়ে নিজেরা সীমাহীন ক্ষমতা ও ধনসম্পদের দিকে যেতে পারেন, যে লোকটা আশি টাকা জরিমানা হবার মত তুচ্ছ অপরাধ করে সে জরিমানার টাকা জমা দিয়েও প্রাণে বাঁচতে পারে না, বীভৎস যন্ত্রণায় মরে?

এই ঘটনা ও তার ধারাবাহিক সম্ভাবনা থেকে যারা রাজনৈতিক ফায়দা তুলবার চেষ্টা করেন, খুনের দায় তাদেরও হাতে লাগে। যে ব্যবস্থা এই অবস্থায় পৌঁছায় যে গ্রামাঞ্চলের খবর ঠিকভাবে রাখবার ও পাবার জন্য স্থাপিত ইন্টারনেট সিস্টেম অফিসারারা ব্লু-ফিল্মের ওয়েবসাইট খুলে দেখেন সে ব্যবস্থা থেকে কোনও দল কোনও সুস্থ অবস্থায় পৌঁছতে পারবে না। একটিই শক্তি আমাদের পরিপার্শ্বকে রক্ষা করতে পারে জাগ্রত জনমত। অন্যায়ের খোলাখুলি প্রতিবাদ করা আর প্রতিবাদের সমর্থন করা।

মালদহের ঘটনার একটি মাত্র আশার জায়গা আমরা দেখতে পেলাম এই জঘন্যতম উদাসীনতা ও অন্যায়ের জোরদার বিরোধিতা সবচেয়ে আগে করল বার অ্যাসোসিয়েশন। তার পরপর অবশ্য প্রশাসন, এমনকি উর্বতন পুলিশমহল ও দায় স্বীকার করেছে। পরস্পরকে দোষারোপ তো করছেনই, তবু এখনও পর্যন্ত এই মহলেও প্রতিবাদ উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে শিক্ষিত চিন্তাশীল মানুষের জোরালো প্রতিবাদ ছাড়া বাঁচবার কোনও রাস্তা নেই আর।